হারায়ে খুঁজি : পত্রালি

ঈশিতা ভাদুড়ী

আমরা যেমন ভাব বিনিময় করেছি অনেক / রুলটানা কাগজ আর কাঠপেন্সিলে / আজকে কিশোর আজকে তরুণ ভাবে না সেসব...

আমাদের তখন স্মার্টফোন ছিল না, হোয়াটস্অ্যাপ, ফেসবুক, মেসেঞ্জার ছিল না। তখন আমাদের হাতে কাঠপেন্সিল ছিল, ফাউন্টেন পেন ছিল। আমরা একে অন্যের সঙ্গে চিঠিপত্রের মাধ্যমে ভাব-বিনিময় করতাম।

শুধুমাত্র ভাব-বিনিময়ের জন্যে নয়, দূরে বসবাসকারী মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের জন্যেও পত্রের সূত্রপাত হয়েছিল। কবে থেকে শুরু সেটা অবশ্য আমার জানা নেই। তবে প্রাচীনকাল থেকেই পত্রের সৃষ্টি। গ্রিক পুরাণে যেমন পত্রের ব্যবহার পাই, ভারতীয় পুরাণেও হাঁসের পায়ে পায়রার পায়ে বেঁধে পত্র প্রেরণের কাহিনি পেয়েছি আমরা। বিভিন্ন দেশের ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি রাজা-রাজড়াদের বিশেষ কাজেও পত্র রচিত হত। পোস্টকার্ডে, ইনল্যাণ্ড লেটারে বা খামে পত্র-বিনিময় প্রাচীন কাল থেকে নয় বলেই ধারণা। কথিত আছে বিশ্বের দীর্ঘতম পত্র লিখেছিলেন নিউইয়র্কের একজন নারী তার প্রেমিককে। তিন হাজার কুড়ি ফুট লম্বা সে চিঠি তিনি লিখেছিলেন ১৯৫২ সালে কোরিয়াতে যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে, তাঁর প্রেমিক তখন মার্কিন সৈনিক হিসেবে যুদ্ধক্ষেত্রে ছিলেন। তা যাই হোক, পত্রের বিভিন্ন ধরন হয়, সেই নানারকম চিঠিপত্রের মধ্যে বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য যেমন রয়েছে, ভাষাগত পার্থক্যও সেরকম রয়েছে।

একসময় বিভিন্ন প্রখ্যাত মানুষের অটোগ্রাফ নিয়ে অটোগ্রাফ খাতা রাখারও প্রথা ছিল। কবি-লেখকদের চিঠি দেওয়ারও রেওয়াজ ছিল। এবং বলা বাহুল্য অপরিচিত গুণমুগ্ধ পাঠকের চিঠির জবাবও লেখক-কবিরা দিতেন তখন। এখন তো মানুষ কবি-লেখকের কাছে সরাসরি শারীরিক ভাবে পৌঁছেই যায়। কিন্তু আমাদের আগের প্রজন্মে পত্র-বিনিময়ের প্রচলন খুবই ছিল, এমনকি আমাদের ছোটবেলায়ও আমরা কবি-লেখককে চিঠি দিতাম, উত্তরও পেতাম। উলটো দিকে বাড়ি হওয়া সত্ত্বেও আমি নবনীতা দেবসেনকে পোস্টে চিঠি পাঠিয়েছিলাম। শুধুমাত্র নবনীতা দেবসেন নয়, বেশিরভাগ কবি-লেখকের সঙ্গেই আমার পত্রের মাধ্যমে প্রথম পরিচয়, সন্তোষকুমার ঘোষ, শঙ্খ ঘোষ, পূর্ণেন্দু পত্রী, কেতকী কুশারী ডাইসন, মৈত্রেয়ী দেবী প্রমুখ কবি-লেখকরা আমাকে পত্রের মাধ্যমেই চিনেছিলেন। প্রত্যেককেই চিঠি লিখে যথাসময় উত্তর পেয়েছি এবং সেই সব চিঠিও এমন আন্তরিক থাকত, এখনকার দিনে বেমানান।

রবীন্দ্রনাথ ভানুসিংহের পত্রাবলীর একটি চিঠিতে লিখেছিলেন — ‘‘চিঠি জিনিষটা ছোট, মালতীফুলের

মতো, কিন্তু সেই চিঠি যে আকাশের মধ্যে ফুটে ওঠে সেই আকাশ মালতীলতার মতোই বড়ো।”

চিঠিপত্র বিষয়টি প্রয়োজনীয় হয়ে থাকলেও পত্রসাহিত্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, বিশেষত সাহিত্যের ক্ষেত্রে। সেই কোন প্রাচীনকাল থেকে প্রেরক ও প্রাপকের মধ্যে ভাব ও সংবাদ দেওয়া-নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োজনভিত্তিক এক জনপ্রিয় যোগাযোগ মাধ্যম এই পত্রাদি। সেই পত্রই যখন ব্যক্তিগত আবেদনকে অতিক্রম করে হয়ে ওঠে সার্বজনীন, তখন সে সাহিত্য হয়ে ওঠে। সাহিত্যের সঙ্গে চিঠিপত্রের নিবিড় সংযোগের কথা সর্বজনবিদিত।

বিশ্বসাহিত্যে চিঠিপত্রের একটি বিরাট ভূমিকা রয়েছে। পাশ্চাত্যের কবি সাহিত্যিকদের মধ্যে কবি কীটস, জর্জ বার্নার্ড শ, লর্ড টেনিসন প্রমুখের রচিত পত্রাবলী যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। জন কীটস মৃত্যুর এক/দেড় বছর আগে প্রেমে পড়েছিলেন ফ্যানি ব্রাউনের। তাঁকে চিঠি লিখেছিলেন, ‘‘আমার প্রেম আমাকে স্বার্থপর তৈরি করে দিয়েছে, আমি তুমি ব্যতীত আমার অস্তিত্বের কথা ভাবতেই পারি না, তোমাকে পুনরায় দেখার ব্যাপারটি ছাড়া বাকি সব আমি ভুলে যেতে রাজি, আমার জীবন থেমে গেছে ঠিক ওই জায়গাটিতেই, আমি এর বেশি কিছু দেখতে পাচ্ছি না...”।

বাংলা সাহিত্যেও বেশ কিছু পত্র সাহিত্যের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছে। সেই সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন কোনও কোনও প্রখ্যাত লেখক। নবীনচন্দ্র সেনের ‘প্রবাসের পত্র’, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ‘বিলাতের পত্র’, স্বামী বিবেকানন্দের ‘পত্রাবলী’ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে বাংলা পত্র-সাহিত্যের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদানই সবচেয়ে বেশি। কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর প্রথম স্ত্রী নার্গিস বেগমকে যে চিঠিটি লিখেছিলেন, গবেষকদের মতে সেটি পৃথিবীর সেরা একটি প্রেমপত্র এবং তাঁর শ্রেষ্ঠ অন্যতম সাহিত্যকর্ম হিসেবে বিবেচিত!

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিন্নপত্রে লিখেছেন — ‘‘পৃথিবীতে অনেক মহামূল্য উপহার আছে, তার মধ্যে সামান্য চিঠিখানি কম জিনিস নয়। চিঠির দ্বারা পৃথিবীতে একটা নূতন আনন্দের সৃষ্টি হয়েছে। আমরা মানুষকে দেখে যতটা লাভ করি, তার সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে যতটা লাভ করি, চিঠিপত্র দ্বারা তার চেয়ে আরো একটা বেশি কিছু পেয়ে থাকি। চিঠিপত্রে যে আমরা কেবল প্রত্যক্ষ আলাপের অভাব দূর করি তা নয়, ওর মধ্যে আরো একটু রস আছে যা প্রত্যক্ষ দেখা-শোনায় নেই। মানুষ মুখের কথায় আপনাকে যতখানি ও যে রকম করে প্রকাশ করে লেখার কথায় ঠিক ততখানি করে না। আবার লেখায় যতখানি করে মুখের কথায় ততখানি করতে পারে না। এই কারণে চিঠিতে মানুষকে দেখবার এবং পাবার জন্য আরো একটা যেন নতুন ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হয়েছে। আমার মনে হয়, যারা চিরকাল অবিচ্ছেদে চব্বিশ ঘন্টা কাছাকাছি আছে, যাদের মধ্যে চিঠি লেখালিখির অবসর ঘটেনি, তারা পরস্পরকে অসম্পূর্ণ করেই জানে...”

এই পত্রালাপের মধ্যে দিয়েই তো তৈরি হয়ে যেত লেখক-পাঠকের সম্পর্ক। শুধুমাত্র লেখক-পাঠকের সম্পর্ক নয়, ব্যক্তিগত স্তরেও এই পত্র-বিনিময়ের মাধ্যমেই প্রকাশিত হত ব্যক্তি-মানুষের পরিচয়, ফুটে উঠত পত্রলেখক ও প্রাপকের মধ্যে একটি সংযোগ ও উত্তাপের স্বাক্ষর। সেই পত্রই আজ আমাদের জীবন থেকে বিলুপ্তপ্রায়।

‘রানার ছুটেছে তাই ঝুমঝুম ঘন্টা বাজছে রাতে / রানার চলেছে খবরের বোঝা হাতে, / রানার রানার চলেছে রানার! / রাত্রির পথে পথে চলে কোনো নিষেধ জানে না মানার। / দিগন্ত থেকে দিগন্তে ছোটে রানার-রানার / কাজ নিয়েছে সে নতুন খবর আনার...’ — হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে এই গান আমার কিশোরীবেলার গান, যখন আমার কাছে পত্রের আলাদা কোনও মানে ছিল না। এই গান শুনতে শুনতেই আমার বেড়ে ওঠা, আমার পত্রের মধ্যে ডুব দেওয়া, সেই পত্রের মাধ্যমে অন্তরের ভাব-প্রকাশ,

রাস্তার দিকে অপলক তাকিয়ে ডাকপিওনের অপেক্ষা...

অল্প বয়সে দিনের পর দিন চিঠি লিখতাম। শুধু যে লেখক-কবিকে লিখেছি তা' নয়, বন্ধু, দাদা, দিদি সবাইকেই লিখতাম। এবং শুধু আমি লিখতাম তা'ই নয়, প্রায় সকলেই লিখত। আমার আগের প্রজন্ম বা তার আগের প্রজন্মকে বাদই দিলাম, আমাদের প্রজন্মেরও অধিকাংশ মানুষেরই চিঠিচাপাটির অভ্যেস ছিল ভয়ানক। একসময় পেন-ফ্রেণ্ড হত খুব, পত্রমিতালি যাকে বলে। তখন বিভিন্ন পত্রিকাতে পেন-ফ্রেণ্ডের বিজ্ঞাপন থাকত, সেই দেখে অনেকে পেন-ফ্রেণ্ড করত। আমার অবশ্য পত্র-মিতালি বলতে যা বোঝায় তা কখনও করা হয়নি। আমার বন্ধু সোমার পেন-ফ্রেণ্ড ছিল, রোজি মঙ্গা নামে একটি হিমাচল প্রদেশের মেয়ের সঙ্গে পত্রমিতালি হয়েছিল। চিঠিপত্রে যোগাযোগ হলেও অনেকের মধ্যে দেখাও হয়নি কখনও হয়ত, অনেকে আবার পত্রমিতালি থেকে পরিচিত হয়ে সংসার করেছে এরকম নজিরও আছে, আমাদের এক বন্ধুর দিদি এক ড্যানিশ মানুষকে বিয়ে করে বহু বছর সংসার করছে। কয়েকবছর আগে ইন্টারনেটে পড়েছিলাম পত্রমিতালির এক পুরনো গল্প, আমেরিকার সিয়েরা আর ইংল্যাণ্ডের মারলিন যখন প্রথম বারের মতো দেখা করে তখন একজনের বয়স ৬৭ আরেকজনের ৬৮, অথচ দু'জনের যোগাযোগ শুরু আরও ৫৬ বছর আগে। আটলান্টিকের ওপার থেকে চিঠি আসে সিয়েরার স্কুলের ঠিকানায়, তারপরে দুজনের পত্রমিতালি হয়। এইসব অনেকই হত তখন, এখন এই একবিংশ শতাব্দীতে হারিয়ে গেছে এই পত্র-মিতালি।

আগে মোড়ের মাথায় বা পাড়ায় পাড়ায় লাল ডাকবাক্স থাকত। সেই বাক্সে কত চিঠি ফেলতাম, নবনীতাদির অমর্ত্য সেনকে লেখা খামও পোস্ট করেছিলাম। পরে কিউ এম এস (QMS) অর্থাৎ কুইক মেইল সার্ভিস চালু হল। পিনকোড লেখা থাকলে একদিনের মধ্যে ঠিকানায় পৌঁছবে। কোনও কোনও চিঠি একদিনও লাগত না তখন। ইনল্যাণ্ড লেটার বা খামের ওপর 'QMS' লিখতে হত। সেই লাল 'লেটারবক্স'-এ আর একটা খোপ করা হয়েছিল, যেখানে 'QMS' লেখা চিঠিগুলো ফেলা যাবে। সেইদিনের সেই লাল ডাকবাক্সের অপরিহার্যতা আজকে ইমেইলের আড়ালে হারিয়ে গেছে। অনেকদিন পরে লণ্ডনে গিয়ে সেই লাল লাল 'লেটারবক্স' দেখে মনে বড় পুলক জেগেছিল।

চন্দননগরে থাকতাম যখন, সবচেয়ে বেশি চিঠি আসত আমার নামে। অনেকগুলো বছর দিদিমার বাড়িতেও ছিলাম আমি। হিন্দুস্থান পার্কে 'ইলাবাস' যতীন্দ্রমোহন বাগচীর বাড়ি হিসেবে পরিচিত হলেও আমার কাছে সেটি দিদিমার বাড়িই। বাড়ির নম্বর না দিয়েও অনেক চিঠি নির্ভুলভাবে এসে যেত আমার কাছে তখন। ঈশিতা ভাদুড়ী, হিন্দুস্তান পার্ক, কলকাতা-২৯ লিখলেই এসে যেত চিঠি আমার কাছে। পোস্টম্যানেরও জানা হয়ে গিয়েছিল আমার নামখানি। রাস্তার দিকে অপলক তাকিয়ে আমারও ছিল ডাকপিওনের জন্যে অপেক্ষা...

তখন সবাই রাইটিং প্যাড কিনত, কতরকম ডিজাইনের। কেউ কেউ তো বানাত প্যাড, নিজের নাম ঠিকানা দিয়ে, আজকের দিনে 'কাস্টমাইজড্' করা যাকে বলে। সেই প্যাডের সুন্দর কাগজে কতরকম চিঠি লেখা হত। আমার মনে আছে আমি বা কাকলি একদিন কেউ স্কুলে না এলেই আমরা পরস্পরকে চিঠি লিখতাম। সেই চিঠি পোস্ট করা হত না, যেদিন স্কুলে দেখা হত, সেইদিন দিয়ে দেওয়া হত। একবার পাশের ক্লাসরুম থেকে কাকলি আমাকে একটি চিঠি লিখেছিল, লম্বা ফুলস্কেপ কাগজে। সেই চিঠি আমরা অনেকে মিলে এ-সেকশনের মেয়েরা পড়ছিলাম। কী লেখা ছিল মনে নেই, সেই বয়সের তুচ্ছাতিতুচ্ছ কথাই ছিল মনে হয়। অ্যাসিস্ট্যান্ট হেড মিস্ট্রেস সুষমাদি ক্লাসরুমের বাইরে দিয়ে যাওয়ার সময় দেখে ভাবলেন কী-না-কী চিঠি, নিষিদ্ধ নিশ্চিত! তৎক্ষণাৎ ক্লাসরুমে ঢুকে চিঠি নিয়ে চলে গেলেন, খুঁটিয়ে পড়ে সেখান থেকে অনুচিত বেআইনি কিছু খুঁজে বার করবেন বলে। বলা বাহুল্য তেমন কিছুই না পেয়ে

সেই চিঠি অবশেষে প্রত্যর্পণ করলেন।

চিঠিতে শব্দের একটা ম্যাজিক থাকে, একটা জাদু, সেই জাদুতে মন ভরে ওঠে। আমাদের জীবন থেকে হারিয়ে গেছে সেই সব মহামূল্য চিঠিপত্রের যুগ, সেইসব মণিমাণিক্য। বিভিন্ন অনুভূতি দিয়ে কত শব্দ সাজিয়ে তার মধ্যে প্রাণসঞ্চার করে ব্যক্তিগত কথোপকথন হত যে পত্রালাপে, সেই পত্রবিনিময় তো মুছেই গেছে আমাদের জীবন থেকে। প্রতিদিন ডাকপিওনের অপেক্ষায় থেকে থেকে ডাকবাক্সের দিকে ঘন ঘন উঁকি মারা এসবই হারিয়ে গেছে। আগে চিঠিতে ওপরে চন্দ্রবিন্দু লেখা হত, কেউ কেউ 'রা' লিখতেন, সম্ভবত অনুকূল ঠাকুরের শিষ্যরা লিখতেন, আমাকে শীষেন্দু মুখোপাধ্যায় চিঠি দিয়েছিলেন ওপরে 'রা' লেখা।

আমাদের অল্প বয়সে বড় বড় কবি সাহিত্যিকের স্নেহ-মাখা চিঠির প্রশ্রয় যেমন হারিয়ে গেছে, সেরকমই জন্মদিনে শুভেচ্ছার যে পোস্টকার্ড আসত, যে গ্রিটিংস কার্ড, সেগুলিকে এখন ফেসবুকের দেওয়াল বিলুপ্ত করে দিয়েছে। নববর্ষ আর বিজয়াতে গুরুজনদের চিঠি লেখাও আর নেই। বাবা প্রতি বছর বিজয়া-দশমীতে দিদিমা-ঠাকুমাকে, মেসোমশাইকে, জেঠুদের চিঠি লিখতেন, আমাদেরও লিখতে হত। এখন আর এসব কিছুরই চল নেই। চিঠিপত্রের সব রোমাঞ্চই শেষ হয়ে গেছে। এখন আমরা হোয়াট্‌স্‌অ্যাপে 'শুভ বিজয়া' লিখি, ফেসবুকে 'শুভ জন্মদিন' লিখি।

সেই যে সেই সম্বোধনগুলো ছিল, শ্রীচরণকমলেষু, শ্রদ্ধাস্পদেষু, স্নেহাস্পদেষু, কল্যাণীয়েষু, সুজনেষু, শ্রীচরণেষু এইগুলো এখন আর লেখা হয় না, এই শব্দগুলো অভিধানের পৃষ্ঠায় আটকে রইল। সেদিনের সেইসব চিঠিপত্রের মাধ্যমে যে উপলব্ধির গভীরতা ও আন্তরিকতার প্রকাশ ছিল, সেসবও বা আজ কোথায়! সেদিনের সেই চিঠিপত্র হাতে নিয়ে রক্তে শিরশিরানি অনুভব হারিয়ে গেল আমাদের জীবন থেকে একে একে। গোপন খামে ব্যক্তিগত হরফে যে অক্ষর বিনিময় হত... / রহস্যে ও মায়ায় যে স্পর্শ থাকতো নির্ভুল ... / তারা কেন মিলিয়ে গেল অর্থহীন কুয়াশায় / কেন তারা উড়ে গেল তুমুল হাওয়ায়...

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন — 'যারা ভালো চিঠি লেখে তারা স্বপ্নে জানলার ধারে বসে আলাপ করে যায়। তার কোনো ভার নেই। বেগও নেই। স্রোত আছে...'

আজ সেইসব দিন বিলুপ্ত, আজ হোয়াট্‌স্‌অ্যাপে 'গুড মর্নিং' আর 'গুড নাইট' মেসেজ আর ফেসবুকে আমাদের এলোমেলো লেখালেখি সবই লাইক-সর্বস্ব...

ঈশিতা ভাদুড়ী : বিশিষ্ট কবি এবং গদ্যকার।